

কেবলই রাত হয়ে যায়

কেবলই রাত হয়ে যায়

আশীফ এন্ডাজ রবি

☼ তাম্রলিপি

কেবলই রাত হয়ে যায়

আশীফ এন্তাজ রবি

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

তাম্রলিপি : ৬৮৯

প্রকাশক

এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি

তাম্রলিপি

৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ

নিয়াজ চৌধুরী তুলি

বর্ণ বিন্যাস

তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ

ইন্টারনেট প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : ৭০০.০০

Kebol-e Rat Hoyo Jay

By: Ashif Entaz Rabi

First Published: February 2023 by A K M Tariquul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 700 \$20

ISBN: 978-984-97315-2-8

উৎসর্গ

প্রথম সারির দৈনিক পত্রিকায় একটি গল্প ছাপা হয়েছে। সাধারণত আবর্জনা টাইপের বিষয়গুলো সাহিত্য পাতায় গল্প হিসেবে প্রকাশ পায়। প্রথম সারির সাহিত্য পত্রিকাগুলো প্রকাশ করে প্রথম শ্রেণির আবর্জনাসমূহ।

তবু কী মনে করে, সেই গল্পটার প্রথম লাইন পড়ে ফেললাম। তারপর সেই লেখকের অন্যান্য গল্প খোঁজা শুরু করলাম। খুব বেশি গল্প তিনি এখনো লেখেননি। যে কয়টি লিখেছেন সব পড়া শেষ।

তারপর লেখককেই খুঁজে বের করলাম। তাঁর লেখা গল্পের মতো, তিনিও অসাধারণ।

আলভী আহমেদ।

আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ গল্পকার।

ভূমিকা

প্রাণীজগতে উভচর প্রাণী বলে একটা ব্যাপার আছে। যেমন- ব্যাঙ। এরা ডাঙায়ও থাকে, আবার পানিতেও থাকে।

আমি বর্তমানে উভচর জীবন যাপন করছি।

বছরের একটা সময় আমি থাকি আমেরিকায়। আরেকটা সময় থাকি বাংলাদেশে। মাঝখানের সময়টুকু থাকি আকাশে। বাংলাদেশ থেকে আমেরিকার দূরত্ব অনেক। আকাশেই কেটে যায় ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময়।

এই উভচর জীবন নিয়ে আমি মোটেও সন্তুষ্ট না। কিন্তু ব্যঙের মতো আমিও নিরুপায়। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও- এই উভচর জীবনের পরিসমাপ্তি আপাতত টানতে পারছি না।

একজন মানুষ যখন গর্তে পড়ে, তখন সে গর্ত থেকে বের হওয়ার উপায় খোঁজে। আর একজন গল্পকার গর্তে পড়লে, সে খোঁজে কাগজ কলম। গর্তের ভেতরের গল্পটা সে লিখে ফেলতে চায়।

আমেরিকার জীবন আনন্দের। আমেরিকার জীবন বেদনারও। এখন আনন্দ বেশি নাকি বেদনা- এটা নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি কাগজকলম নিয়ে বসেছি- এই আনন্দ বেদনার গল্প লিখতে।

এই তো।

আশীফ এত্তাজ রবি

ওয়াশিংটন ডিসি/ বরুণ্ডি, যুক্তরাষ্ট্র/বাংলাদেশ।

“Somewhere beyond right and wrong, there is a garden. I will meet you there.”

— জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি



বিশাল কাঠের বাড়ি। তিন তলা। কিন্তু কোনো বারান্দা নেই।

বারান্দার জায়গায় বসানো আছে অন্য একটা জিনিস। রেলিং ঘেরা কাঠের মাচা। এরা বলে ডেক। দেখতে অবিকল লঞ্চের ডেকের মতো। দিব্যি চেয়ার টেবিল পেতে বসা যায়।

যখন খুব হাওয়া বাতাস খেলে, তখন কারো মনে হতে পারে— সে লঞ্চের ডেকে বসে আছে। যে লঞ্চ দীর্ঘদিন যাবৎ ঘাটে নোঙর করা। কবে ছাড়বে, তার ঠিক ঠিকানা নেই। কোনো দিন নাও ছাড়তে পারে।

মুহিব বসে আছে তার বাসার ডেকে। শনিবারের সকাল। কোনো কারণে তীব্র বাতাস বইছে। বাতাসে মুহিবের চুল উড়ছে। তার মাথার চুল পাতলা। হাওয়া বাতাসে এই সামান্য চুলে আলোড়ন হবার কথা নয়। তবু আজকের বাতাসের তীব্রতা বেশি, পাতলা চুলেই ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

মুহিবের হাতে সিগারেট। এখনো আগুন ধরানো হয়নি। সিগারেট হাতে সে চুপচাপ বসে আছে। তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। এখান থেকে পুরো এলাকা ভালোভাবে দেখা যায়।

এই দেশের বাড়িগুলো সব একই রকম। একই রঙ, একই ডিজাইন, এমনকি উচ্চতাও এক। মনে হয়, একই বাড়ি ফটোকপি করে পুরো এলাকায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে। দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু ভীষণ একঘেয়ে।

ঢাকায় এই সমস্যা নেই। বা চকচকে পাঁচ তলা বিল্ডিংয়ের পাশে ভাঙাচোরা দোতলা বাড়ি। আবার উঁচু অটালিকার পিছনেই কাঁচা বস্তি। কিংবা ব্যস্ত রাস্তার

ঠিক মাঝখানে ম্যানহোল। সেই ম্যানহোলে আবার ঢাকনা নেই। প্রতি মাসে একটা না একটা দুর্ঘটনা লেগেই আছে। ঢাকনা লাগিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু সেই সমাধান কেউ করছে না। ভাবনাহীন একটা শহর। ঢাকার মতো টেনশনফ্রি পরিবেশ এরা কোথায় পাবে?

এখানকার অধিকাংশ বাড়ি তিন তলা। নিচতলা থাকে মাটির নিচে। এর নাম বেজমেন্ট। আমেরিকানরা বেজমেন্টের ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস। অনেক টাকা খরচ করে তারা এই পাতালঘর সাজায়। কেউ কেউ বেজমেন্টকে পুরো জিমনেশিয়াম বানিয়ে ফেলে। কেউ বানায় মিনিবার। নানান ধরনের ওয়াইন সাজিয়ে রাখে।

বাংলাদেশিদের কথা অবশ্য ভিন্ন। তারা বেজমেন্টকেও কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। প্রথমেই একটা বিছানা পেতে ফেলে। তারপর সেটা ভাড়া দিয়ে দেয়। প্রচুর বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী এই এলাকায় থাকে। কাছেই জর্জ ম্যাশন ইউনিভার্সিটি। সেখানে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট ভরতি। কম ভাড়ার খোঁজে ছাত্রছাত্রীরা এসব বেজমেন্টে উঠে পড়ে।

মুহিব নিজেও এক সময় বেজমেন্টে থাকতো। তখন সে নতুন আমেরিকায় এসেছে। স্টুডেন্ট ভিসায়। বাড়িওয়ালা এক বাংলাদেশি। লোকটা বেশ ভদ্র, পরিশীলিত। অত্যন্ত প্রমিত ভাষায় কথা বলেন। অনেকে স আর শ আলাদা করে উচ্চারণ করতে পারেন না। ইনি পারতেন। পারবেন নাইবা কেন। এই লোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতেন। ভালোই ছিলেন দেশে। কী মনে করে একটা ফেলোশিপ নিয়ে এখানে আসলেন। আর ফিরে যাননি। বাড়িটারি কিনে থিতু হয়েছেন।

ভদ্রলোকের স্বভাব ছিলো বিচিত্র। ইলেকট্রিসিটির বিল বাঁচানোর জন্য মাঝরাতে হিটার বন্ধ করে দিতেন। মাটির নিচের ঘর— এমনিতেই সেখানে ঠান্ডা বেশি। বরফ টরফ পড়লে তো কথাই নাই। ঠান্ডায় জমে যাবার দশা। সারা রাত মুহিব ঘুমাতে পারতো না। দু-তিনটা কম্বল জড়িয়েও কুঁকড়ে থাকতো।

একে তো আমেরিকায় নতুন এসেছে— তারপর সে খানিকটা মুখচোরা। মুখফুটে কিছু বলার সাহস হতো না। তবু একদিন ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বলেছিলো। দিনের বেলায় দরকার নেই, রাতে যেন হিটারটা চালু রাখা

হয়। ভদ্রলোক মন দিয়ে মুহিবের কথা শুনেছেন। তারপর একটা লম্বা বক্তৃতা দিয়েছেন। মাস্টার মানুষ— কথায় বলায় দক্ষ।

হিটার চালানো তো কোনো ব্যাপার না। কয় ডলারই বা বিল আসে। ইচ্ছা করেই চালাই না। কেন জানো? আমাদের কার্বন নিঃসরণ কমানো দরকার। হিটার এসি— এগুলো পরিবেশের শত্রু। পরিবেশের দিকে আমরা যদি খেয়াল না রাখি— তা হলে কে রাখবে।

ভদ্রলোকের যুক্তি শুনে মুহিব থ হয়ে গিয়েছিলো। এরপর আর কোনো কথা চলে না। অন্য কোনো বাসা দেখতে হবে। ওদিকে ভদ্রলোকের বক্তৃতা তখনো শেষ হয়নি।

এক্সিমোদের কথা একবার ভাবো। ওদের তো হিটার নেই। ওরা কীভাবে বাঁচে? আসল কথা হচ্ছে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া। একটু শীত লাগলেই হিটার চালানো, একটু গরমে এসি। এই করেই আমেরিকানদের ইমিউনিটি নষ্ট হয়ে গেছে। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একদমই নেই। এক ফোঁটা বৃষ্টিতে এরা ম্যালেরিয়া বাঁধিয়ে বসে। গিয়ে ভর্তি হয় হাসপাতালে। বুঝলে মুহিব, আমাদের প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। তবেই না রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

অবশ্য হিটার এসি বন্ধ রেখেও ওই ভদ্রলোকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তেমন বাড়েনি। তার অকাল মৃত্যু ঘটেছিলো। থ্রোট ক্যান্সারে। তিন মাসেই খেল খতম। মৃত্যুর পর তার পরিবার অথই সাগরে পড়ে। ইনস্টলমেন্টের টাকা দিতে না পারায়, বাড়িঘর নিলামে উঠে। ভদ্রলোকের স্ত্রী ভার্জিনিয়া ছেড়ে চলে যান অন্য স্টেটে, বাচ্চাদের নিয়ে। খুব সম্ভবত বাফেলো। ওখানে জীবনযাত্রার ব্যয় নাকি অসম্ভব সস্তা। ঢাকার চাইতেও কম।

ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব ভালো মানুষ ছিলেন। মুহিবকে অসম্ভব মমতা করতেন। মুহিব তাকে ডাকতো আপা। সাবেরা আপা।

- মুহিব, তোমার ভাইয়ের কথায় কিছু মনে করো না।
- না আপা, আমি কিছু মনে করেনি।

- ও আগে এ রকম ছিলো না। আমেরিকায় আসার পর এমন হয়ে গেছে। সারাক্ষণ ডলারের হিসাব করে। বিশ্বাস করো, আগে ও অন্য রকম ছিলো।
- আমি কিছু মনে করিনি আপা। আপনি ভাববেন না।

ভদ্রলোক যখন হাসপাতালে ভর্তি, সাবেরা আপা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মুহিবকে বলেছিলেন, ভাই মুহিব, সোনা ভাই আমার। তোমার ভাইকে মাফ করে দাও। ও খুব কষ্ট পাচ্ছে। খুবই কষ্ট পাচ্ছে।

সাবেরা আপা এখন কোথায় আছে, আল্লাহই জানে। কত বছর হয়ে গেলো। বেঁচে আছে কি না- কে জানে।

মুহিব ঘড়ির দিকে তাকালো। এখন বাজে দশটা বিয়াল্লিশ। আরও আঠারো মিনিট। ঠিক এগারোটায় সে একটা সিগারেট ধরাবে। দিনের প্রথম সিগারেট। ইদানীং সে ঘড়ি ধরে সিগারেট খাচ্ছে। গুরুটা হয়েছিলো প্রতি ঘণ্টায় একটা করে। এরপর প্রতি দুই ঘণ্টায় একটা সিগারেট। এখন সে সিগারেট ছাড়া পুরো চার ঘণ্টা পার করে দিতে পারে। অভ্যাস হয়ে গেছে।

অথচ এই মুহিবই এক সময় মুড়ির মতো সিগারেট খেতো। এদেশে সিগারেট খাওয়াকে মোটামুটি অপরাধের পর্যায়ে ধরা হয়। এমনকি ডাক্তাররাও কোনো বিড়িখোর রোগীকে গুরুত্বের সাথে দেখেন না। কেমন একটা অবহেলার ছাপ থাকে তাদের ব্যবহারে।

মুহিব দীর্ঘকাল যাবৎ কোমরের ব্যথায় ভুগছে। তার স্পাইনাল কর্ডে কোনো সমস্যা হয়েছে। এক্স-রে প্লট দেখে ডা. রিচার্ড বলেছেন, এবার সিগারেটটা ছেড়ে দাও। অনেক তো হলো। সিগারেট খেলে তোমার ব্যথা ভালো হবে না।

সিগারেটের সাথে কোমরের ব্যথার কী সম্পর্ক- ডা. রিচার্ড তা ভেঙ্গে বলেননি। কিছু থাকলে তো বলবে। তবু ব্যথা নিয়ে তার কাছে গেলেই প্রথম প্রশ্ন- সিগারেট খাওয়া বাদ দিয়েছো? ভাবখানা এমন- সিগারেটের ধোঁয়া সরাসরি কোমরে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে। ব্যথাটা সেখান থেকেই হচ্ছে।

মুহিব তর্ক করতে পছন্দ করে না। আজ অবধি একটা তর্কেও সে সুবিধা করতে পারেনি। কথা বলার সময় আসল পয়েন্টগুলো মনে পড়ে না। সব পয়েন্ট মনে পড়ে বাসায় ফেরার পর। এজন্য মুহিব ডাক্তারের সাথে কোনো তর্কে জড়ায়নি। এর বদলে সিগারেট ছেড়ে দেবার চেষ্টা করেছে। ঘণ্টা চুক্তিতে সিগারেট খেয়ে বেশ ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। এক প্যাকেট সিগারেট এখন সহজে শেষ হতে চায় না। দিন তিনেক লেগে যায়।

মুহিবের এক অল্প বয়সি বন্ধু আছে। তার নাম শ্যামল। ছেলেটা চোখের পাতা না ফেলে মিথ্যা বলতে পারে। শ্যামলের ভয়ংকর অ্যাজমা। ডাক্তার তাকেও জিজ্ঞাসা করেছে, সে সিগারেট খায় কি না। শ্যামল অবলীলায় বলেছে, সিগারেট আমার দুই চোখের বিষ। তবে মাঝে মধ্যে বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়লে দু-এক টান মারি। তাও সেটা বছরে এক দুবার। সিগারেট খাওয়ার পর এত গিল্টি ফিলিংস হয়, জানো ডাক্তার? মাউথওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলি।

শ্যামলের কথায় ডাক্তাররা খুবই খুশি। অ্যাজমার একটা ওষুধ আছে। ইনহেইলার, নাম ব্রিউ। বেশ দামি। এক প্যাকেটের দাম ত্রিশ ডলার। ডাক্তার ব্যাটা নিজের স্টক থেকে সেই ওষুধ শ্যামলকে ফ্রি দেয়, তাও প্রতিমাসে। ভাবা যায়?

অথচ শ্যামল যে চেইন স্মোকার— এটা বোঝার জন্য শার্লক হোমস হতে হয় না। তার গা দিয়ে সবসময় ভকভক করে গন্ধ বের হয়। কিন্তু ডাক্তার তাকে বিশ্বাস করে বসে আছে। এই দেশের ডাক্তারগুলো খানিকটা নির্বোধ ধরনের।

একবার কোমরের তীব্র ব্যথা নিয়ে মুহিব হাসপাতালের গেলো। ইমার্জেন্সিতে। ডাক্তার এসে বললো, কী সমস্যা?

- কোমরে ব্যথা। ব্যথায় মরে যাচ্ছি।
- তুমি মরবে না। আজ অবধি কোমরের ব্যথায় কেউ মরেনি। মেডিকেলে হিস্ট্রিতে এমন কোনো নজির নেই। আশা করি, এই খবর তোমার মনে স্বস্তি আনবে। তা তোমার ব্যথা কতখানি?
- অনেকখানি। তীব্র ব্যথা।
- এক থেকে দশ স্কেলে যদি ধরো, তোমার ব্যথা কোন স্কেলে আছে?
- একশ।

- একশ না। এক থেকে দশের মধ্যে তুমি ব্যথাকে কত নম্বরে ফেলবে?
- একশ।
- তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো না? তুমি কি ইংরেজি পারো? তোমার ট্রান্সলেটর লাগবে? আমরা কি ট্রান্সলেটর কল করবো? তোমার মাদার টাঙ কী?

এরপর মুহিব আর কিছু বলতে পারেনি। তীব্র ব্যথায় জ্ঞান হারিয়েছিলো। হাসপাতালে থাকতে হয়েছিলো পুরো দুই সপ্তাহ। রিলিজের সময় তার হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো- লম্বা একটা কাগজ। সেখানে লেখা, কী কী করা যাবে না। এক নম্বরে- ভারি জিনিস তোলা যাবে না। দুই- এক নাগাড়ে বসে থাকা যাবে না। তিন- কষ্টকর কোনো ব্যায়াম করা যাবে না, তবে হালকা এক্সারসাইজ অবশ্যই করতে হবে। চার- নো স্মোকিং।

কোনো মানে হয়।

মুহিব আবার ঘড়ি দেখলো। দশটা একান্ন। আর নয় মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। সে অবাক হয়ে লক্ষ করলো, এই ছুটির সকালে হাতে সিগারেট নিয়ে অপেক্ষা করতে তার ভালো লাগছে। আচ্ছা, এক কাপ কফি বানাতে কেমন হয়। ঘরেই এক্সপ্রেসো কফির মেশিন আছে। বাজারে কফির ছোটো ছোটো কৌটো পাওয়া যায়। একটা কৌটা মেশিনে ঢুকিয়ে দিলেই হলো। কফি তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসবে। পানি জ্বাল দেয়ার ঝামেলা নেই।

দারুণ মেশিন, অথচ দামে বেশ সস্তা। কম দাম বলেই লোকজন ঝাঁকের মাথায় এক্সপ্রেসো মেশিন কিনে ফেলে। তারপর তারা কিনতে শুরু করে কফির ছোটো ছোটো কৌটা। এই ছোটো কৌটার দাম আশ্চর্যজনকভাবে বেশি। আসল ব্যবসা এখানেই। সস্তার এক্সপ্রেসো মেশিন একটা ফাঁদ। যে কফি পছন্দ করে না, সেও দিনে একবার এক্সপ্রেসো মেশিনে ছোটো একটা কৌটা ঢুকিয়ে অপেক্ষা করে।

হাতে মৃত সিগারেট নিয়েই মুহিব ঘরে ঢুকলো। এক কাপ কফি নিয়ে আবার ডেকে এসে বসলো। ঝড় বাতাসটা বেশ ভালো লাগছে।